বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

প্রতিটি শতকের প্রতিটি দশক আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আধুনিক কালের বিংশ শতক, বিশেষত এই শতকের চল্লিশের দশক নানা ঘটনায় পরিকীর্ণ। আত্মসমর্পণ নয়, সাময়িক পশ্চাদপসরণ নয়, সংগ্রাম-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা-হিংসা-প্রতিহিংসা— এই মৌলিক সত্যগুলির বাইরে সাধারণ মানুষের কোনো তত্ত্ব নেই। এখানে তার উদ্‌বর্তনে হৃদয়ের অনুশাসন চরম ও পরম সত্য। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রেমের জন্যই আপাতত হিংসা, মমতার বশেই আপাতত যুদ্ধ। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তিগুলির পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন কিছুটা জাগতিক সম্পদের, কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের, পরিপূর্ণ মানসিক সুস্থতার। যতদিন এই সম্পদ, এই সাচ্ছল্য কতিপয় মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত, ততদিন বেশিরভাগ লোক প্রেমের বাইরে পড়ে থাকবে। তাদের জন্য ছিনিয়ে আনতে হবে ভালো থাকার আকর। অতএব প্রতিরোধ, অতএব শ্রেণি-সংগ্রাম।

উত্তাল চল্লিশে ভারতের রাজনৈতিক বাতাবরণ বহু তরঙ্গ-আবর্তে সংক্ষুব্ধ। তার একদিকে রয়েছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতভেদ, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ, ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সুভাষচন্দ্রের দেশনায়কত্ব, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ, তে-ভাগা আন্দোলন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের (৭.৫.১৮৬১-৭.৮.১৯৪১) জীবনাবসান, সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৫.৮.১৯২৬-১৩.৫.১৯৪৭) অকালমৃত্যু ও গান্ধীজির (২.১০.১৮৬৯-৩০.১.১৯৪৮) অপমৃত্যু তো রয়েছেই। দুর্ভাগ্য আমাদের এখানেই পিছু ছাড়েনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১.৯.১৯৩৯-২.৯.১৯৪৫) মারণযজ্ঞে আমরাও উদ্‌ভ্রান্ত। বলা বাহুল্য, চল্লিশের এইসব ঘটনা কবিতার শব্দলাঞ্ছনেও প্রমিত।

বাংলা কবিতার চল্লিশের দশক ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তেরো-চোদ্দ বছর ধরেই বিস্তৃত। কারণ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারায় কোনো কিছুই ছিন্নমূল নয়। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বাংলার জনমানসের একটা অংশে পরিবর্তনের অভিঘাত শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত নাগরিক চিন্তাভাবনার একেবারে মূলকেই স্পর্শ করেছিল। তার ভাবনার জগৎ ছিল অন্তরলোক থেকে বিশ্বলোক। সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধের চেতনায় অভিষিক্তি কবিগণ চল্লিশের কবিতায় নতুন সুর আনলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যেই কয়েকজন নতুন কবির প্রতিষ্ঠা ঘটে গেল। অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন— এঁরাই প্রথম কবিতায় নতুন বার্তা শোনালেন। ১৯৩৬-এ 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে-বছরই স্পেনের গৃহযুদ্ধ, স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের পক্ষে বিশ্ব-জনমত গড়ে ওঠা— এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ-ছাড়াও রয়েছে বাংলায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৪২),

'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৪৪) এবং স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ (২৬ মার্চ ১৯৪৮) হওয়া। এই অশান্ত আবর্তের মধ্যে দেখা দিলেন আরও কয়েকজন কবি— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, মৃগাঙ্ক রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোলাম কুদ্দুস, অসীম রায়, চিত্ত ঘোষ, কৃষ্ণ ধর প্রমুখ। এঁদের সকলের লেখা নিয়েই চল্লিশের কবিতা। চল্লিশের দশকের কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথকেও উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে। এই চল্লিশের দশকের কবিদের চিরায়ত প্রেমের, নিসর্গমুগ্ধতার, আত্মমগ্নতার কবিতার কথা ভুলে থাকা যাবে না। তাই চল্লিশের কবির নিবন্ধনে অশোকবিজয় রাহা, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, বাণী রায়, রাজলক্ষ্মী দেবীর নাম আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমরা অবশ্যই মনে রাখব সমকালীন বাংলা কবিতা-পত্রিকাগুলির কথাও। এই সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিশিষ্ট কবিতা-পত্রিকাগুলি হল 'কবিতা' (ত্রৈমাসিক, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, ১৯৩৫), 'জীবাণু' (মাসিক, সম্পাদক সুশীল রায়, ১৯৩৬), 'নিরুক্ত' (ত্রৈমাসিক, সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১৯৪০), 'একক' (ত্রৈমাসিক, সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ১৯৪১) ও 'অঙ্গীকার' (দ্বিমাসিক, সম্পাদক শচীন ভট্টাচার্য ও পূর্ণেন্দু পত্রী, ১৯৪৯)।

চল্লিশের কবিতার বহিরঙ্গ রূপে ছিল গদ্য-প্রবণতা। এ-বিষয়ে মণীন্দ্র রায় লিখেছেন, "আমাদের কালে একটা বড় চেষ্টা ছিল, কবিতাকে গদ্যের কাছাকাছি আনা এবং তা সত্ত্বেও কবিতার প্রাণধর্মকে টিকিয়ে রাখা। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে যাঁরা কবিতার ক্ষেত্রে এসেছেন তাঁদেরও অনেকের চেষ্টা এদিকে অব্যাহত ছিল।" ('আমার কালের কবি ও কবিতা', প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুআরি ১৯৮১, প্রকাশক : কথামালা, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৬৪) সময়-সংঘাতের নিরন্তর চাপে চল্লিশের অনেক কবিই অনুভব করেছিলেন যে এই দুস্থ মর্মান্তিক সময়ক্রমকে চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে কবিতায় লিরিকের লালিত্য, অলংকারের শিঞ্জন, ছন্দের অনুরণন বেমানান হবে। তাই চল্লিশের অনেক কবিই নিটোল গদ্যবহুল পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের মধ্যে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। আসল কথা, বিপন্ন স্বদেশের তমসাছন্নতা, জীবনযাপনের ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতাকে প্রজ্ঞাপিত করতে গিয়ে চল্লিশের কবিতা গদ্যগন্ধী প্রবণতাই দাবি করেছিল। সময়ের দাবিকে মনে রেখেই চল্লিশের কবিরা গদ্য-বাহুল্যের মধ্যে ভাবের মুক্তি খুঁজেছিলেন। যেমন সমর সেনের (১০.১০.১৯১৬-২৩.৮.১৯৮৭) মধ্যবিত্ত জীবনভাবনায় উঠে এসেছে—

তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিলো
কামনার বিশাল ইশারা!
ট্যাঁকেতে টাকা নেই,
রঙিন গণিকার দিন হ'লো শেষ,...
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ!

('ঘরে বাইরে')

অথবা গদ্যভঙ্গিতে রাম বসুর (১৯২৫-২০০৭) গভীর উচ্চারণ—

আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও—
তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই স্টীমার শস্যেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায়?

তাই চরম সিদ্ধান্ত— 'আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক।' তারপর দৃপ্ত কণ্ঠে নির্দেশ—

এসো
বাইরে এসো—
আমরা হেরে যাব না
আমরা মরে যাব না
আমরা ভেসে যাব না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে—
এসো বাইরে এসো
আমার হাত ধরো
পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে।

('পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে', কাব্যগ্রন্থ : তোমাকে, ১৯৫০)

দিনটি ছিল ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯। স্বাধীনোত্তর ভারত। মানুষের মতো বাঁচার দাবি নিয়ে বন্দি ভাই ও ছেলের মুক্তির জন্য বউবাজার স্ট্রিটে (অধুনা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট) তে-ভাগা সমিতির ডাকে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে এসেছিলেন হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনার সুদূর পল্লিগ্রাম থেকে মহিলারা, কলকাতার বস্তিবাসী আর মধ্যবিত্ত নারীরাও এসেছিলেন। সেদিন 'ভারত সভা হলে' শ-আড়াই নারী জড়ো হয়েছিলেন আর অনিলা দেবী (১৯১৩-২০০৩) সেই সভায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সভার শেষে মহিলারা ১৪৪ ধারা ভেঙে পথে নেমেছিলেন। এই শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের গুলি চলেছিল। এতে চারজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ প্রাণ হারান। নিহত মহিলাদের মধ্যে ছিলেন লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া ও গীতা। ট্রাম, বাস থেমে গেছে— দোকানপাট বন্ধ। মিছিল ছত্রভঙ্গ। গলির মোড়ে মোড়ে স্তব্ধ মানুষের ভিড়। কিছু ছাত্র, কিশোর ও মহিলার দঙ্গল বয়ে নিয়ে চলেছে একটি প্রাণহীন দেহ সকলের স্তব্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে। একটি অজ্ঞাতনামা পুরুষের নিথর দেহ। এই নামহারা মৃতের উদ্দেশে রাম বসু নিবেদন করলেন—

ও যেখানে পড়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে।

জনহীন রাজপথ সংজ্ঞাহীন ট্রামের লাইন
এ পাশে নিষ্প্রাণ বাড়ি জড়সড় অন্ধকার মুখে
কয়েকটা পুলিসট্রাক, হেলমেট, রাইফেল, জীপ,
একটা শেলের শব্দ, মাটি ফেটে ধোঁয়ার নাগিনী
পাক খেয়ে উঠে পড়ে, শূন্যে দোলে চক্রময় ফণা।

রক্তাক্ত সে শুয়ে আছে পৃথিবীর সান্ত্বনার কোলে।

ওখানে রয়েছে শুয়ে গুলি-বিদ্ধ একটা মানুষ
বুকে তার রক্তপদ্ম মুখে তার চৈত্রের পলাশ
অঙ্গজুড়ে শান্ত নদী যন্ত্রণার গোলাপ বাগানে
তাকে ঘিরে গাছ পাখি বসন্তের প্রকৃতি আকাশ।

একটা হত্যার রক্তে ভেসে গেল শহরের মুখ
চমকে নিভল আলো, তারপর ঘন অন্ধকারে
তার খোলা চোখে এল আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ
সেই চোখে চোখ রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনীর।

ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।

('একটি হত্যা', কাব্যগ্রন্থ : যখন যন্ত্রণা, ১৯৫৪)

এই ঘটনায় কমিউনিস্ট লেখক ও কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৭.৬.১৯২০-১৯.৪.২০০৩) কলমে অশ্রু-রক্ত-আগুনে ঝলসে উঠল—

শান্তি নেই সেদিন থেকেই
কী করে ভুলব আমি, কী করে ভুলব
সেদিন লতিকা সেন কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায়
বন্দী স্বামীপুত্রদের মুক্তি দাবি করে
বুলেটে জবাব পেল;
দেখেছি কেমন করে দৃপ্ত কণ্ঠ ডুবে গেল ভলকে ভলকে রক্ত
রক্তের উচ্ছ্বাসে;
দেখেছি কেমন করে পাগ্‌লা কুত্তা হেলমেট মাথায়
লাঠি-গুলি-গ্যাসে দাঁতে নখে
রক্তবমনে উদ্‌গারে
বিষ্ঠায় নোংরায়
জীবনটা ক্লেদাক্ত করল।
শান্তি নেই সেদিন থেকেই। শুধু তারপর
অনেকদিন মাঝরাত্রে তন্দ্রা ছুটে স্তম্ভিত শুনেছি
দুধের বাচ্চার কান্না— যেন একলা অন্ধকার ঘরে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কোনো এক মাতৃহীন শিশু—
মা তার হারিয়ে গ্যাছে তারাভরা কান্নার আকাশে।

('শান্তি নেই', কাব্যগ্রন্থ : মেঘবৃষ্টিঝড়, ১৯৫১)

১৯৪৬ সালে ব্রেথওয়েট কারখানার শ্রমিকদের ওপর গুলি চালনা ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগের প্রতিবাদে খিদিরপুরে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে শামিল হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে মেটাল বক্স, ব্রুক বন্ড, জে স্টোন ও অর্ডন্যান্স কারখানার শ্রমিক। শ্রমিক-আন্দোলনের এই নতুন তরঙ্গ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১২.২.১৯১৯-৮.৭.২০০৩) কবিতার প্রেরণার উৎসভূমি। তিনি লিখলেন—

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই!
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত, এক হলে বলো
পরোয়া কাকে?

শিকলে বেঁধেছো; হাত দিলে শেষে
মুখের গ্রাসে!
শয়তান, চাও ভাঙতে কলিজা
গুলিতে গ্যাসে?

পার পাবে নাকো। দেওয়ালে ঘোষণা :
শেষ লড়াই—
বারুদে লাগালে আগুন যখন,
পুড়ে হও ছাই।।

দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের ভিৎ পড়ো-পড়ো
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা-নাঙ্গারা জড়ো।
শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে
সোজা জিজ্ঞাসা;
দু'শো বছরের রক্ত শুষেও
মেটেনি পিপাসা?
বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছোয় ডাক;
যেখানে যে আছে, ময়দানে সব এক হয়ে যাক।
কড়া-পড়া হাতে শিকল ভাঙার
শপথ কঠিন—
আমাদের হবে কলকারখানা, জায়গা জমিন।
রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই।
ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবি কে রোখে? কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে?
('জবাব চাই', ১৭.১.১৯৪৬)

সাম্যবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেক আগেই আত্মজবোধে আমাদের ডাক দিয়েছেন—

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
('সকলের গান', কাব্যগ্রন্থ : পদাতিক, ১৯৩৮-৪০)

"আমি আমার জীবনে একটি সত্যকেই সব সত্যের চেয়ে বড়ো বলে মনে করি। সে হল শিল্প, সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে আমরা যা কিছু করি না কেন, সব কিছুই মানুষের জন্য, মানুষকে মহত্তর জীবনে উন্নীত করার জন্য। সেই সঙ্গে নিজের আত্মিক তৃপ্তির জন্যও বটে। দেশের দুর্গত মানুষের সম্পর্কে বলবার মতো আমার কিছু কথা ছিল, ছিল কিছু জ্বলন্ত প্রতিবাদ; অবিচার, অত্যাচার, শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে। যে ভাষায় বলেছি, যে আঙ্গিকে বলেছি তাকে যদি কেউ কাব্য বলতে না চান তাতে ক্ষতি কি?" ('এষা', ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৭৪ আশ্বিন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ)— কথাগুলি বলেছেন আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ (১২.১২.১৯১০-২২.১০.১৯৮১)। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে সর্বহারার পক্ষ নিয়ে বলতে পারেন—

থুতু দিয়ে চিঁড়ে-ভিজানো মালিক-মজুরের নয়া-প্রেমের বুলি
ভেদ পন্থার বড়াই,
আমরা মানি না, মানি শুধু মহাপৃথিবীর পথে সঙ্গবদ্ধ
রাঙা আগুনের শিখায় দীপ্ত ন্যায্য দাবীর লড়াই।
('৭ নভেম্বর', কাব্যগ্রন্থ : ফতোয়া, ৭ নভেম্বর ১৯৪৭)

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের আত্মময় সাধনা—

মানববুদ্ধির প্রথম উন্মেষ লগ্ন থেকে
আমি মুক্তি চেয়েছি :
প্রতিটি মানুষের
প্রতিটি শস্যকণার
প্রতিটি মঞ্জরী-মুকুল-পুষ্পের,
মুক্তি চেয়েছি
নৃত্যের সঙ্গীতের কাব্যের
মহান উদার জড়জাগতিক চিন্তাশীলতার।
('বিপ্লব', কাব্যগ্রন্থ : উদাত্ত ভারত, ১.৫.১৯৫৪)

বিমলচন্দ্র ঘোষের অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৩০.১০.১৯০১-২৫.৬.১৯৬০) ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিল বিশাল এবং বোধের ক্ষিপ্রতা ছিল অসামান্য। বৈদান্তিক পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৬.১.১৮৬৮-১৬.৯.১৯৪২) পুত্র সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকও। তাঁর চেতনায় লীন হয়ে আছে সমকালীন পৃথিবীর ইতিহাসতত্ত্ব—

তুমি বলেছিলে জয় হবে, জয় হবে;
নাট্‌সী পিশাচও অবিনশ্বর নয়।
জার্মানি আজ ম্রিয়মাণ পরাভবে;
পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয়।
অন্তত রুষ বাহিনী বন্যাবেগে
কবলিত করে শোষিত দেশের মাটি;
বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে
স্বাধীন প্যারিস্, যথারীতি পরিপাটী;

এ-বারে সমরে, শান্তিতে সহযোগী
মার্কিন্ ঢালে সমানে শোণিত টাকা;
ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী
ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা।।

২

অবশ্য চীনে নেতারা স্বার্থপর,
সর্বথা জনশক্তির বাধ সাধে;
স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর,
জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে।
তাছাড়া আবার রক্ষকে ভক্ষকে
ভেদ ভোলে স্বচ্ছন্দ বেলজিয়ামে;
ইটালীর প্রতিবিপ্লবী পক্ষকে
সম্মুখে রেখে ত্রাতারা তারণে নামে।
তথাচ গ্রীসের ট্রট্স্কীয় বামাচারী
বিনষ্ট চার্চিলের বাক্যবাণে;
ধরে তুরস্ক বিশ্রুত তরবারি;
আর্জেন্টিনা প্রগতির রথ টানে।।

('১৯৪৫', কাব্যগ্রন্থ : সংবর্ত, ১০ এপ্রিল ১৯৪৫)

বিষ্ণু দে-র (১৮.৭.১৯০৯-৩.১২.১৯৮২) 'সন্দ্বীপের চর' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭) শেষ কবিতা হল '১৫ই আগস্ট'। তিনি অসংশয় দৃষ্টিতে বরণ করেন '১৫ই আগস্ট'-কে—

মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল কলকাতার বেড়ী

চণ্ডীমণ্ডপের পাঠে, পঞ্চায়েতী বটে
গৃহস্থ সন্ধ্যায় কিংবা মুদীর চালায় শোনা যায় সেইরাবণের
স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা
চারপাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিংবা চেড়ী
শ্রাবণের সন্ধ্যা থেকে রটে পথে পথে শ্রাবণের
কলকাতার মুক্তির বন্যায় সন্দেহ শঙ্কার
মৃত্যুর মারীচদের তড়িৎ ত্বরিত শেষ, নিঃশেষ অসুর

... ...

শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান,
গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে
ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ
হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ!
বন্যা নয় প্রাণেরই বিন্যাস
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
শত শত নেতা আসে
গান্ধীজীর প্রতিভাসে

সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির মতে ১৫ আগস্টের আজাদি ছিল ঝুটা। তাই বিষ্ণু দে-র 'শান্তি, মৈত্রী, প্রেমের উচ্ছ্বাস' নিয়ে কমিউনিস্ট-শিবিরে উপহাস-পরিহাসের অন্ত ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাকীর্ণ শবের মহাশ্মশানে বসে এক কবি পাঁচটি কবিতায় যে-পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন— 'অন্নদাতা', 'অন্ন দাও', '১৩৫০', 'দূরের ভাই' আর 'নিমন্ত্রণ'— সেই কবিতা-পঞ্চকের আলো কাব্যলোকে আজও অনির্বাণ জ্বলছে।

বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নিরন্ন নরনারী যখন মহানগরীর বুকে শেষ-শয্যা রচনার জন্য ছুটে আসছে তখন এই এক কবি অমিয় চক্রবর্তী (১০.৪.১৯০১-১২.৬.১৯৮৬) বলছেন—

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য—
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ ক'ষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগর।
তাদের দেওয়ায় ফলবে না ধান শান-বাঁধা কলকাতা।।

সেই মহাদুর্দিনে কবিকণ্ঠে হঠাৎ বজ্র-নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল—

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।

একদিকে এই 'নতুন চাষের মন্ত্র', অন্যদিকে 'অন্নহারা বাংলা দেশে' যখন 'সোনার ধান নিরুদ্দেশ' তখন বিদেশাগত যুদ্ধের সৈনিককে সম্বোধন করে কবি বলছেন—

কার স্বদেশে এসেছো জেনো দূরের ভাই।
ভারতমাটির ধুলো

নীলাম্বরের আকাশতলে অরণ্যে
মনে-মনেই কপালে তুলো।
অচেনা মাঠ, নদীর ঘাট, লক্ষগ্রাম, সংসারে
এখানে প্রাণ পেয়েছে পুজো,
তাকেই খুঁজো,
দেশকে পাবে আপন লোকের বুকে।

কিন্তু এই কবিতা-পঞ্চকের মধ্যমণি হল '১৩৫০' শীর্ষক কবিতাটি। ভাষা ও ছন্দে কবিতাটি অশ্রুসিক্ত শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন—

হাত থেকে তার প'ড়ে যায় খ'সে
অবশ আধলা ধুলোয়।
চোখ ঠেকে খোলা অসাড় শূন্যে
প্রাণ, তুমি আজো আছো ঐ দেহে,
আছো মুমূর্ষু দেশে।
কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে
কড়া রোদ্দুর প্রখর দুপুরে ফাটে।

কঙ্কালদেহিনী মৃত্যুপথযাত্রিণী বাংলার মেয়ের মর্মস্পর্শী রূপকল্প রচনায় কবির বাণীশিল্প অনবদ্য— 'কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে'।

মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সেই অন্ধকার দিনগুলিতে কবির বেদনা ভাষা পেয়েছে 'সন্দ্বীপ', 'সাংবাদিক', 'আহুতি', 'সনেট', 'সত্যাগ্রহ' প্রভৃতি কবিতায়। সমাজ-বিবেকের সঙ্গে শিল্পকর্মের যে কোনো অসংগতি নেই, এই কবিতাগুলিতে তা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের স্মরণে রাখা দরকার, ১৯৪৮ সাল থেকে কবি অমিয় চক্রবর্তী মার্কিন দেশে প্রবাসী। কিন্তু 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩) অনেক কবিতা স্বদেশের মাটিতে বসে বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত। তাই 'পারাপার'-কে কবি চার ভাগে বিন্যস্ত করেছেন— 'ছড়ানো মার্কিনি', 'ভারতী', 'য়ুরোপা' এবং 'দুই তীর'। 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের 'ভারতী' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে অনুভূতির সজল ছায়া বেদনায় ঘনীভূত।

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (৮.২.১৯২৫-২১.১১.১৯৪৫) 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় যে-শোভাযাত্রা বার করে তাতে অংশগ্রহণকালে রামেশ্বর পুলিশের গুলিতে মারা যান। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে স্মরণীয় করতে প্রতি ২১ নভেম্বর ছাত্রদল শোকসভায় মিলিত হয়। ১৯৪৭ সালে ২১ নভেম্বর জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও তে-ভাগা আইন পাশের দাবিতে বিরাট কৃষক মিছিলের সঙ্গে 'রামেশ্বর দিবস' উলপক্ষে ছাত্র মিছিলও ছিল। ২১ নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখের ছাত্র-কৃষক মিছিলকে ব্রিটিশ আমলের কায়দায় 'স্বাধীন' বাংলার সরকার মোকাবিলা করলেন। যুদ্ধোত্তর কলকাতার প্রথম শহিদ রামেশ্বরের স্মৃতি নতুন বাংলার ছাত্রসমাজের কাছে এক পবিত্র উত্তরাধিকার। তারই অনুরণন সাংবাদিক-সাহিত্যিক অসীম রায়ের (৭.৩.১৯২৭-৩.৪.১৯৮৬) রক্তঝরা কলমে—

হাজার শ্রাবণ জল ঢেলে যাক ঘাসের চাপড়া ঘিরে
পথের ধুলোয়, সে দাগ তবুও মুছবে না মুছবে না,
যে যৌবনের শিক্ষা হয়েছে রক্তের স্বাক্ষরে
ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে তাকে ভুলাতেও পারবে না
নতুন শপথ এসেছে আবার; অস্ফুট কলস্বরে
হাতের মুঠিতে এখনো যখন আগামীর আনাগোনা
মিলেছি আবার হয়েছি জমাট একুশে নভেম্বরে।

('২১ নভেম্বর', ২৩.১১.১৯৪৭)

আবার অতীতকে ফিরে দেখা। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল— এই সাতটি বছর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎস বিভীষিকা পৃথিবীকে পৈশাচিক নরকে রূপান্তরিত করল। তারই বর্ণনায় কবি অজিত দত্ত (২৩.৯.১৯০৭-৩০.১২.১৯৭৯) বলছেন—

আতঙ্কে সুড়ঙ্গ-পথে ভীত বীর খোঁজে রসাতল,
মহামান্য মহাজন প্রাণভয়ে করে হাহাকার,
পাপের নিয়তি আসে, অব্যর্থ সে গৃধিনী-কবল,
জীবন্তের শব-ভুক্, কৃষ্ণ অভিশাপ বিধাতার।

কবি প্রলয়-লগ্নকে বলেছেন 'মাহেন্দ্র-মুহূর্ত'। তাঁর কথায়—

মাহেন্দ্র-মুহূর্ত এই ভয়ংকর মৃত্যুর স্তুতির।
হে তান্ত্রিক, শুরু করো তোমার নিষ্ঠুর বামাচার
না হতে রক্তের স্রোতে খোঁজা শুরু স্বর্ণশস্যকণা
আবার সংগ্রাম হবে স্বর্ণলঙ্কা আর জীর্ণ চীর,
পুনরায় আকাশেরে বিঁধে দেবে লক্ষ হাতিয়ার
ভীষ্মের মতন, যদি ব্যর্থ হয় তোমার সাধনা।

('বোধন', কাব্যগ্রন্থ : নষ্টচাঁদ, ১৯৪৫)

প্রলয়ের অন্ধকারে এই অশিববিনাশী 'বোধন' মন্ত্রোচ্চারণে অজিত দত্তের কবিমানসের নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হল। ধিক্কারে

ভর্ৎসনায়-ব্যঙ্গভাষণে এ-যেন আর-এক কবি। তিনি বলেন—

ভুখ-মিছিলে চোখের আলোর কোনোই মূল্য নাস্তি—
এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি।

('শাস্তি', কাব্যগ্রন্থ : প্রাগুক্ত)

কিন্তু অন্ধকার যতই মসিকৃষ্ণ হোক, তার থেকেও 'উত্তরণ' আছে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে পৌঁছে সারা পৃথিবীর সঙ্গে কবিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—

অধমর্ণ বালির প্রতাপ
ঋণলব্ধ শক্তির নেশায়
যে-পথে হেনেছে অভিশাপ
সে-পথ পশ্চাতে লুপ্তপ্রায়।

কেননা মৃত্যুর রক্তসমুদ্র পেরিয়েই মানুষ মৃত্যুঞ্জয় মহিমায় উত্তীর্ণ হয়।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৫.৮.১৯২৬-১৩.৫.১৯৪৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯৪১-৪২) মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে উৎসর্গিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক কর্ম শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে দুই কবির উক্তি স্মরণীয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "সুকান্ত বড় কবি হলেও বয়স তার একুশ পেরোয়নি। তার বেশীর ভাগ লেখাই আরও কম বয়সের।" (ভূমিকা, 'সুকান্ত সমগ্র', প্রকাশক : সারস্বত লাইব্রেরী) অন্য কবি তরুণ সান্যালের (জন্ম : ২৯ অক্টোবর ১৯৩২) কথায়, "...সুকান্ত সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমুদ্রসন্ধানী রূপ।" ('কেন সুকান্ত', সুকান্ত স্মৃতি, সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত সংকলনগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ : ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০০) এইসব কথা আত্তীকরণ করে বলা চলে, ইতিহাসের অমোঘ অস্ত্রশালায় সুকান্ত-দধীচি অস্থিমালার বজ্রে মানুষ বরাভয়ের মন্ত্র শুনবে। তিনি মহামানবের 'বোধন' কামনা করে বলেছেন—

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

এই সর্বনাশের জন্য দায়ী কারা? অন্যায় যারা করছে তারাই শুধু নয়, নীরবে যারা এই অন্যায় সহ্য করে যাচ্ছে তারাও দায়ী—

ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী। আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম : ১৯ অক্টোবর ১৯২৪) কবি সুকান্তের কথার অনুরণন তুলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—

যে মাঠে সোনা ফলানো যায়, আগাছা জমে ওঠে
সেখানে, এরা জানে না কেউ— কী রঙে ঝিলিমিল
জীবন,— তাই বাঁচে না কেউ; দুয়ারে এঁটে খিল
নিজেকে দূরে সরায়, দিন গড়ায়। সেই সোনা
ঝরে না, ভেঙে পড়ে না ঢেউ— দুয়ারে মাথা কোটে,
এখানে মন বড় কৃপণ— এখানে থাকব না।

('ঢেউ', নীলনির্জন কাব্যগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬১)

সিদ্ধেশ্বর সেনের (২৬.৩.১৯২৬-২১.৪.২০০৮) স্বদেশ জিজ্ঞাসায় নন্দিত জীবনের অনশ্বর ব্যস্ততার প্রতি দায়বোধ ছিল। এই দায়বোধই তাঁর কবিতার নিরন্তর চলমানতার ধাত্রী। তাই তাঁর ৪৫-এর আবেগ সম্পূর্ণ টানটান থাকতে পারে ৫১-তেও যখন তিনি উচ্চারণ করেন—

হে স্বদেশ
অপমান হত এ দেশ
হে ভয়ংকর দেশ
হে ভয়াল ভ্রূকুটির দেশ
হে শ্মশান-মশানচারী দেশ
হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের দেশ
আমার ভালোবাসার দেশ
অশ্বত্থের ছায়ায় নদীর কিনারে

ডাহুকের দেশ
মেঘলা আকাশের দেশ
টইটুম্বুর সরোবরের দেশ
সাত রাজার ধন এক মাণিকের দেশ
মা-জননীর কোল ঘেঁষে যশোদা-দুলালের দেশ
('জননী জন্মভূমিশ্চ')

চল্লিশ-পঞ্চাশ ব্যাপী উপদ্রুত বাংলা, ভারতবর্ষ তথা গোটা দুনিয়ার লাঞ্ছিত মানবতার পাশে দাঁড়িয়ে কবি মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে তার কাছেও কৈফিয়ত তলব করেন—

আমি কৈফিয়ৎ তলব করি,
মৃত্যুদূত:
কোথায় হতবাক্ শিশু
কি কিশোরের জ্যোতির্ময় চোখ থেকে
জিজ্ঞাসা উপড়ে ফেলে
সাপের মতো জিভ বার করে জিভ উগরেছ?
কতো না সীমন্তিনীর সাধে বারুদ লাগিয়ে
জিঘাংসায়, উল্লাসে ঢলে পড়েছ?
কতো জোয়ান সমর্থ দেহ বুলেট কুরে
বন্দুকের কুঁদোয় থেঁতলিয়ে
শকুনের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছ?
কোথায় কোন গর্ভবতীর পবিত্র সম্মান
জানোয়ারের উত্তেজনায় ছিঁড়ে খুঁড়ে
রিরংসার নরক জাগিয়েছ?
('আমার মা-কে ২')

মায়ের ভাঙা বুকের আর্তনাদ, কোলের মরা মেয়েটির জন্য জীবনভিক্ষা— এই দিয়ে যে-কবিতার শুরু, সেই মেয়েটির আঙিনায় নেমে আসায়, মায়ের শান্তি ও স্নেহে তার আপাত বিরতি। এই মা কোথাও চলে যান না, সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় তিনি কোথাও 'ধাত্রী' কোথাও 'জননীজন্মভূমিশ্চ' আবার শহরের ফুটপাতে তিনিই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। মা ও সন্তানের এই বিনিময় চলতে থাকে।

'মধুবংশীর গলি' আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৮.১১.১৯১১-২৬.১০.১৯৭৭) যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংলিপ্ত। ৩১৫ পঙ্‌ক্তির এই সুদীর্ঘ কবিতাটি ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে রচিত হলেও প্রথম কবিতা-সংকলন হিসেবে 'মধুবংশীর গলি'-র আত্মপ্রকাশ চুয়াল্লিশের শেষ পর্বে। তবে সেই অস্থির সময়ে শুধু কলকাতা নয়, শহর ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলার হাটে-মাঠে, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবি মণীন্দ্র রায় লিখেছেন— "'মধুবংশীর গলি', সকলেই জানেন সমাজমনস্ক কবিতা এবং আকারে সুদীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এককালে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কলকাতা এবং অখণ্ড বাংলার অজস্র শহরে, এবং বাংলার বাইরেও নানা জায়গায় এ কবিতার আবৃত্তি শোনা গেছে। সেটা ছিল বিদেশী শাসনের নৃশংসতম অধ্যায়, যখন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় কলকাতায় চলছে নিষ্প্রদীপ আর নারীমাংসলোভী বিদেশী সৈন্যের আনাগোনা, এবং তারই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারার সেই ষড়যন্ত্রমূলক দুর্ভিক্ষ। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনেরও তখন তুঙ্গ অবস্থা, আর তারই সঙ্গে মিশে রয়েছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন, প্রগতি সাহিত্য আর নবনাট্য আন্দোলন। এরই বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত এবং বেদনার্ত প্রতিফলন ধরা পড়েছে 'মধুবংশীর গলি' নামক কবিতার দর্পণে।" (ভূমিকা, কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রাজধানী ও মধুবংশীর গলি : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ফাল্গুন ১৩৯৯) দিনযাপনের গ্লানিময় কর্মের অবসানে ২৫ নম্বর মধুবংশীর গলিকে সম্বোধন করে এ-কবিতার কবি বর্ণনা করছেন—

হে পঁচিশ নম্বর
মধুবংশীর গলি,
তোমাকেই আমি বলি।
রৌদ্রস্নাত খাটুনির পর সমস্ত দিন
মেরুদণ্ডহীন
মানুষগুলিকে সম্মান করে,
নগ্ন নগণ্য সন্ধ্যাকে পাই
— তোড়াবাঁধা শ্মশানে পাঠাবার ফুল—

বর্ণনার শেষ উপমাটির প্রসঙ্গ যেমন আমাদের মনকে পীড়িত করে, তেমনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এ-দেশে আগত মিত্রশক্তির সৈনিকদের ঝরে-পড়া 'সামরিক আশিস' তির্যক ব্যঙ্গে ঝলসে ওঠে আশ্চর্য বাক্-প্রতিমায়—

চলে রণদগ্ধ জীবনের ছায়ার মিছিল,
ক্ষুধার হুঙ্কারে ডোবে উন্মার্গের গান।
বাঁকা টুপিপরা কোনো আমেরিকান
কাপ্তেনের লোলুপ শিস
তরুণী রাত্রির গালে চাবুক মারে।

পরিশেষে ইতিহাসের অমোঘ শিক্ষা প্রাণিত করে কবির শিল্পীপ্রাণকে, 'প্রাণকল্লোলে ঐ নবযুগ আসে'—

স্বপ্ন জেগে উঠেছে, উঠেছে
স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়, টিউনিসিয়ায়,
মহাচীনে।
মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে
দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে সৃষ্টির ঈশান কোণে।
গভীর আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত হয়ে তাই ঘোষণা করে :
স্তব্ধডানা পৃথিবীর নীড়ে আসবে নেমে
সুস্থ কামনার স্বর্ণচিল,
... ...
তারপর সুস্থ মুক্ত অনর্গল প্রাণসঙ্গিনীদের নিয়ে
আবিশ্ব প্রাণ-নৃত্যের আসরে
জমবে ভাল, জমবে তখন
মধুবংশীর গলি,
বজ্রনিনাদে তোমাকেও ডেকে বলি।।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (৪.৯.১৯০৪-৩.৫.১৯৮৮) সমকালীন জীবনের বিশ্বস্ত কবি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর পেরিয়ে ভ্রাতৃঘাতী আত্মদ্রোহ, অবশেষে রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খল মোচনের পর স্বাধীন ভারতের আশা ও নৈরাশ্য, সংশয় ও সংকট, কল্পিত আদর্শ ও তার বাস্তবীভবন— সমস্ত কিছুই কবির মানসদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় প্রেক্ষাপটে বাংলার বুকে পঞ্চাশের মন্বন্তর নেমে এল। পঞ্চাশ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধের দক্ষিণা চুকিয়ে গেল। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন 'ফ্যান'। নগরের পথে পথে 'ঠিক মানুষের মতো কিংবা ঠিক নয়, যেন তার ব্যঙ্গচিত্র বিদ্রূপ বিকৃত', 'অদ্ভুত এক জীব', 'উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে আর ফ্যান চায়।' এই অবস্থায় শাসকশ্রেণির পক্ষ থেকে ত্রাণের যে-ব্যবস্থা করা হয় তা প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় নয়, কবির ভাষায় 'তা পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ'। কারণ শাসক শ্রেণির সাময়িক ব্যবস্থাপনায় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ দূর হয় না, আসলে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ যাতে শাসকশ্রেণির মুখের অন্ন কেড়ে না-নেয় সে-জন্য শাসকশ্রেণি 'অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে' 'ক্ষুধাশীর্ণ মুখে ফ্যান ঢেলে দেয়'। এ-এক নিষ্ঠুর প্রতারণা। কারণ ফ্যান অন্নের বিকল্প নয়, অন্নের বর্জ্য পদার্থ। এর বদলে কবি চান— এইসব প্রবঞ্চক নিষ্ঠুর শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষুধাতুর মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠুক। দধীচির হাড়ের চেয়েও কঠিন 'রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল'-এ লড়াই হোক তীব্রতর।

'ফেরারী ফৌজ' কাব্যের (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৮) আর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'তিনটি গুলি'। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের বছর মহাত্মা গাঁধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন—

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত
ভুলে গেল চন্দ্রসূর্য
ভুলে গেল কোথায় প্রভাত।

আততায়ীর তিনটি গুলিকে কবি বলেছেন—

প্রথম গুলির নাম
অন্ধ মূঢ় ভয়।
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয়।
বিবর-বিলাসী হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয়।

আশাবাদী কবির কাছে হন্তারকের গুলির শব্দ 'হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ/মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।/মারণ অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়/শান্তির অমৃত-যন্ত্রে পায় শেষে নয়।'

কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর (১.৩.১৯২১-৩০.৫.২০০০) 'প্রতিজ্ঞা'-র কথাও (কাব্যগ্রন্থ : কয়েকটি সনেট, প্রকাশকাল ১৯৪২) আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি—

আমার মৃত্যুকে আমি বিনামূল্যে পারি না হারাতে
ধিক্কারে বাঁচার চেয়ে মরণকে আমি ভাবি বড়,
প্রতিক্ষণে প্রতিদণ্ডে কাঁদে মন এ দু'শো বছর—
স্বর্ণাঙ্গ ভারত আজ কালো সাজে সবার পশ্চাতে
পর পদানত হয়ে বৈদেশিক বণিকের হাতে
ডুবেছে ঐতিহ্য, ঋদ্ধি, — এর মাটি হলো অনুর্বর।
স্বাধীন হৃদয়বত্তা চূর্ণ করে নকল অন্তর
কৌশলে-চাতুর্যে-শাঠ্যে ভারতের মর্মে মর্মে গাঁথে।
ভারতের কালো সাজ মুছে দেব মৃত্যু বিনিময়ে
এই দুশো বছরের দাসত্বের প্রায়শ্চিত্ত খুঁজে

রক্তে স্বেদে উর্বরতা বুনে দেব লালিত্যে সবুজে,
দস্যুহীন হিন্দুস্থান উদ্ভাসিত নব সূর্যোদয়ে।
আমার রক্তের ছোপে ঘুণ ধরা ভারতীয় ধান
আবার নতুন করে পূর্বেকার পাবে খাদ্যপ্রাণ!

"১৯৪১। হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ। কলকাতার ডক-অঞ্চলে প্রথম জাপানী বোমা নিক্ষিপ্ত হ'ল। সারা পৃথিবী তখন ফ্যাসিস্টদের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমাদের দেশের শতকরা নব্বইজন তো হিটলারকে ভগবানের অবতার বলেই মেনে নিলেন। ঢাকা-রমনায় ব'সে কবি মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্তও এই মতের প্রতিধ্বনি করলেন। কবি-মনীষী দত্তেরও মনে সংশয় : "It is difficult to choose between Communism and Fascism." সেই স্থির বিশ্বাসের কবিতা "কাস্তে"! এতে বলতে চেয়েছিলুম— জার্মান-ফ্যাসিস্টদের বেয়নেট যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন, কাস্তে-হাতুড়ি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে তারা পাঞ্জা লড়তে পারবে না। তাই ঘটল।"— কথাগুলি লিখেছিলেন দিনেশ দাস (১৬.৯.১৯১৩-১৩.৩.১৯৮৫) 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ : ৯ মে ১৯৭৫) ভূমিকায়। 'কাস্তে' কবিতার ইতিহাসও তিনি লিখেছেন— "১৯৩৭ সালে রচিত হল "কাস্তে"। কিন্তু হাতুড়ি বর্জিত করা সত্ত্বেও রাজরোষের ভয়ে কোনও সম্পাদক কবিতাটি প্রকাশ করতে চাইলেন না। ফলে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম। কারণ কবির প্রকাশ কবিতা। এই প্রকাশের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্ব। তা যদি খণ্ডিত হয় তাহ'লে কবিতা রচনা ক'রে কী লাভ। অবশেষে এক বছর পরে কবি অরুণ মিত্রের সৌজন্যে 'কাস্তে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৯৩৮)। কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী-গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে ওই কবিতাটির ছত্র "এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে" উদ্ধৃতি দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকায় দু'টি সার্থক কবিতা লিখলেন। তখনই কবি মহলে সাড়া পড়ে যায়। অগ্রজ কবিদ্বয়ের অনুসরণে এই ছত্রটিকে শিরোনাম ক'রে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ সেকালের তরুণ কবিরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা রচনা করেন। "এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে" নামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্পও "অলকা" মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য 'কাস্তে' কবিতাটি শুধু আমার জীবন নয়, 'বাংলা সাহিত্যে একটি ঘটনা'।" (প্রাগুক্ত)

একটি কবিতাকে নিয়ে কাব্যমহলে যে আলোচনার অন্ত ছিল না তা প্রমাণ করতেই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি উদ্ধার করা হল। দিনেশ দাসের এই প্রতিস্পর্ধার কারণ তিনি বলেছেন— "ভয় আমাকে ভীষণভাবে ভয় করে।" 'বামপন্থী', 'ডাস্টবিন', 'হাতুড়ি', 'বাংলা : ১৩৫০', 'ভুখ মিছিল', 'যুদ্ধবাজদের ভোজ' প্রভৃতি কবিতা তাঁর স্বদেশচিন্তার রূঢ় বাস্তব রূপ। তাঁর কাছে গণদেবতার দুঃখ-দুর্দশা আপন লজ্জা আর গ্লানি ছাড়া কিছুই নয়। চারদিকে হাহাকার, মৃত আর মুমূর্ষের ভিড়ে প্রাণের কঙ্কালটুকু নিয়ে কবি আদিম শরীরটিকে প্রতিকারহীন কষ্টসাধনে চালিত রেখেছেন। কবির এ-এক নিষ্প্রাণ জীবন নিয়ে শুধু দিন যাপনের গ্লানি—

আমার দু'পায়ে ঠেকে শত মৃতদেহ
তবু তো বহেছি প্রাণ নিঃসন্দেহ,
এদের অনেকে একদিন ঝরায়ে অনেক স্বেদজল
মাঠে মাঠে পুঁতে গেছে সোনার ফসল
তাদের মুখের অন্ন মুখে তুলি আজকে যখন
মনে করি প্রাণপণ
আমার কি প্রাণ আছে? যদি বেঁচে থাকি আমি
এর চেয়ে নেই লজ্জা, নেই বড় গ্লানি।

চল্লিশের দশকে ক্ষতবিক্ষত সময় ও অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (২.৯.১৯২০-১১.৭.১৯৮৫) কাব্যচর্চার শুরু। চল্লিশের দুস্থ ও মর্মান্তিক সময়ক্রম থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। স্বাধীনতা তখনও অনাগত, মন্বন্তর তার থাবা নিয়ে ভয়ংকর উত্তেজনা-উদ্‌বেল এই সময়কেই প্রজ্ঞাপিত করেছিল তাঁর কবিতায়—

ভীষণ সব সর্বনাশগুলি
দেখতে হয়নি তোমাকে চোখ মেলে;
জ্বলতে হয়নি ছেচল্লিশের যন্ত্রণায়, মার এবং মহামারির
ভীষণ রোগ রক্তে নিয়ে
দেশ যখন সন্তানের হিংসা, দ্বেষ, মায়ের দেহের মাংস নিয়ে
কাড়াকাড়ি নরক।
দেখতে হয়নি সাতচল্লিশের লুম্বিনীর চেয়ে ইতর
ভারত জুড়ে দেশভাগের উত্তেজনা।

('মৃত্যুর পর, কুড়ি বছর')

স্বাধীনতা-উত্তরকালে মন্বন্তরের করালগ্রাসে বাংলার গ্রামজীবন যখন বিপর্যস্ত, শহরের পথে পথে নিরন্ন মৃত্যুমিছিল তখন সময়-সংঘাতের চাপে, যুগযন্ত্রণার নির্মম নিষ্পেষণে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চল্লিশের নিরন্ন সমাজচিত্রই বিষয়ীভূত

হয়েছিল—

শহরের এখন সন্ধ্যা নেমেছে, তৃষিতের কথকতা...
ফ্যান দাও বলে কারা কাঁদে রাস্তায়
ঘরে নেই ভাত, মাগো, তুই কাছে আয়—
আমি পড়ি বসে কুপির আলোয় জীবনের রূপকথা।

('লাল শপথের রাখি')

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাটির কবি, মাটির কাছাকাছি মানুষের কবি। তাঁর কবিতায় বারবার ধরা পড়েছে মানুষ ও মাটির সম্পর্ক। এর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় তিনি লেখেন—

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম।

মাটি ও মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন মিথ্যা কবিতার চটক-জালিয়াতি তাঁর কাছে অসহ্য মনে হত। তাই তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে মাটি ও মানুষের প্রতি মমত্ব—

একবার মানুষের দিকে
... ...
তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে,
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

কবি মণীন্দ্র রায় (৪.১০.১৯১৯-২৮.৮.২০০০) 'পঞ্চাশের প্রেত' কবিতায় (কাব্যগ্রন্থ : সেতুবন্ধের গান, প্রথম প্রকাশ : জানুআরি ১৯৪৮) সমকালীন কঠিন সত্যকে চিত্রিত করেছেন—

শুধু কি দেখেছ ধ্বংস পেটে-হাত পথের যাত্রায়?
হাড়ের হাপরে শুধু ওঠাপড়া মৃত্যু দেখ তুমি?
ফাটা মাঠে কালসূর্য আকালের দিগন্ত নাচায়?
দেখ না হরিৎ স্বপ্নে গুরু-গুরু আশার মৌসুমী।

কবরের অন্ধকার জানি আজো দুর্ভিক্ষের দেশে।
অমৃতদুর্লভ জানি পিলেভরা পেটের কুইনীন।
অনেক এরণ্ড-নেতা বেপরোয়া স্বার্থের নির্দেশে
গৃহস্থে সজাগ আর চোরে চুরি মন্ত্রণা প্রবীণ।

তাঁর বোধ-বুদ্ধি-হৃদয় ছিল মানবকেন্দ্রিক। অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয় বরং অপ্রিয় সত্যচিত্রকে প্রকাশ করাই তাঁর কবিধর্ম—

আবেগ এখন কাঁপায় এ-মন তুরঙ্গ নয়—
ভাঙা ঝরঝরে ট্যাক্সির মতো, গতির চাপে
অপটু শরীরে বিক্ষোভ যেন। ভীরুপ্রণয়
উধাও। নিটোল বিজ্ঞ ও বাঁকা হাসির মাপে
মেপেছি হৃদয়— শাদা জল দিতে যে ভদ্রতায়
গয়লারা দুধ মাপে, ফাউ দেয়; চুপচাপ দেখি
যে অক্ষমতার বুকে চেপে; আর যে তুচ্ছতায়
চার আনা দামের একটাকা হারে একশ মেকি
টাকার বেতনে ভদ্রতা ঢাকি; সেই আবরণ
কালো পর্দায় ঢেকেছে সদর অন্দর। তাই
প্রেমের চাহনি আনে না পাওয়ার জাদু শিহরণ।
ভিড়ের যাত্রী, চোখে-চোখ রাখা কথাকে ডরাই—
চম্‌কাই— যেন আয়নায়-ছোঁড়া রৌদ্রঝিলিক
ছিঁড়ে দেয় ভিড়ে চলার গড্ডলিকার দড়ি।
ছত্রভঙ্গ স্বাধীনতা তাই লাগে যে অলীক।

('প্রস্তাব', প্রাগুক্ত কা

চল্লিশের যে-সব কবি স্বদেশ ও মানুষের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার তাগিদে এই সমাজতান্ত্রিকতায় আত্মমগ্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যে আরও দুই উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অরুণ মিত্র (২.১১.১৯০৯-২২.৮.২০০০) ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (২.২.১৯১৮-১.৫.১৯৯৮)। অরুণ মিত্র 'লাল ইস্তাহার' কবিতায় লিখছেন—

এখন প্রহর গোনা।
উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়াপড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;
দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো;
মানুষেরা হুঁশিয়ার!
লাল অক্ষরে লট্‌কানো আছে দ্যাখো
নতুন ইস্তাহার।

অন্যদিকে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'বেলাশেষের গান' কবিতায় লিপিবদ্ধ করছেন—

সংগ্রাম শুরু, হুঁশিয়ার থাকো ভাই
প্রাচীরে প্রাচীরে দ্যাখোনি ইস্তাহার?
এ সমাজ ভাঙা নতুন সমাজ চাই
নয়া দুনিয়ার আমরা কর্ণধার।

গোলাম কুদ্দুসের (২০.১.১৯২০-১৪.১২.২০০৬) প্রথম কবিতার বই 'বিদীর্ণ' ১৯৫১ সালে প্রকাশ পেলেও কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন অনেক অনেক দিন আগে। তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কবিতা 'করিম বক্স' আজও স্মরণীয়। করিম নামে এক

সাধারণ মজুরের বসন্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় লড়াইয়ে সরাসরি শারীরিকভাবে যোগ দিতে না-পারার আক্ষেপে কবিতাটি শেষ হয়েছে। কবিতাটির শেষ চারটি পঙ্‌ক্তি হল—

করিম বক্‌সের পক্‌সে যেন জগৎ গেছে জুড়ে,
যখন রক্ত জাগল তখন, অঙ্গ গেছে পুড়ে।
ইংরেজী প্যাকস, জার্মানী প্যাকস। নানান প্যাকসের চাপে
প্যাকসে পক্‌সে মিতালীটা চলে সমান দাপে।

'বিদীর্ণ' কাব্য-সংকলনের আবহে আছে দেশভাগের বিদীর্ণতা, 'জীবনগ্রন্থ' নামের দীর্ঘ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, গ্রন্থকীট স্বপ্নিল এক যুবমানস কীভাবে পারিপার্শ্বিক চাপে পরিবর্তিত হচ্ছে। একদিন বইয়ে বাধ্য মন ইতিহাস ও সাহিত্যের বিদ্যা ও আলস্যে গড়ের মাঠ, উদ্ধত যুবতী দেখে কাটাত। এখন দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, কন্ট্রোল, নিষ্পাপ শিশুর ওপর আল্লার গজব, রাজনৈতিক নেতত্বের মধ্যে ভাগাড়ের মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখে সে অস্থির। 'দুরন্ত দুর্বার নড়ে/বুঝি ফেটে পড়ে/হৃৎপিণ্ড দেশজননীর।' বস্তাপচা কেতাবের মদ সরিয়ে রেখে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরে চালের কাতারে ফুটপাতের ওপর কারখানার দ্বারে 'নতুন জীবনকে খুঁজি'।

তে-ভাগা আন্দোলনের পক্ষে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) অনেক কবিই কলম ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (কবিতা : 'শান্তি নেই'), রাম বসু (কবিতা : 'গজেন মালী') ও পঞ্চাশের কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য। মণিভূষণ 'তেভাগা' কবিতায় লিখছেন—

ভুলে যেতে চাই, পারিনে তা
ভোলা কি সহজ ফসলের
ক্ষীর দুধ রক্তমাখা মুখ,
এসেছিলো সারাতে অসুখ।
... ...
মাঠের আগুনে পোড়ে মাঠ,
মাঝখানে দশানন ভ্রাতা
ঘরভেদী বানিয়েছে বেদী
চৌর্যযুগে সেজেছে সম্রাট।

কবি ও সম্পাদক জহর সেনগুপ্ত 'তেভাগার শহীদ স্মরণে' কবিতায় কৈফিয়ত চেয়েছেন—

মৃত্যু নিয়ে কোন কথা নেই
শুধু জেনে নিয়ে হয়
মৃতের হাড়ের মুনাফা পাবে কে?

কত কথা আছে, কত প্রাণ আছে বিংশ শতকের চল্লিশের দশককে ঘিরে। শুধু কবিতায় নয়, ছোটদের ছড়ায়ও এই দশকের স্বার্থমগ্ন মানুষের কথা রূপ ও বাণী লাভ করেছে। অন্নদাশঙ্কর রায় 'রাঙাধানের খই' কাব্যগ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০) 'খুকু ও খোকা' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৭) কবিতায় সহজ ভাষায় মর্মস্পর্শী প্রশ্ন রেখেছেন—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

আমরা প্রদেশ, জেলা, জমিজমা, ঘরবাড়ি, পাটের আড়ত, ধানের গোলা, কারখানা, রেলগাড়ি, চায়ের বাগান, কয়লাখনি সবই ভেঙে ফেলেছি। আমরা দুর্ভাগ্যবশত ভারত ভাঙতে গিয়ে নিজের বাংলাদেশটাও ভেঙে ফেলেছি। অথচ সামান্য ক্ষতিতে আমাদের উন্মাদনার অন্ত নেই। তাই কবির আবার জিজ্ঞাসা—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

এ-ভুলের কোনো ক্ষমা নেই। এখন স্বদেশ-স্বজন হারানোর ক্ষতকে প্রশমিত করতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাণীকেই আত্মস্থ করতে হবে। তিনি 'পারাপার' কবিতায় লিখছেন—

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।
দুয়ারে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।।

(কাব্যগ্রন্থ : ফুল ফুটুক, প্রকাশকাল ১৯৫১-১৯৫৭)

এ-কথা না-মেনে উপায় কী! এ আমাদের নিজ পাপকৃত

কলঙ্ক। কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮.২.১৮৯৯-২২.১০.১৯৫৪) সে-কথাই আমাদের শুনিয়েছেন—

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো— কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো; মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়— মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না— অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর— শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে— এ-জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে
কয়েকটি দেবদারুগাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয় কণ্ঠ কাছে আসে— মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের— মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরীগ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো— তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

(কবিতা : ১৯৪৬-৪৭, কাব্যগ্রন্থ : বেলা অবেলা কালবেলা)

এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে মানবের অন্তর্নিহিত স্বরূপ— তার সেই নিত্যসত্তা দুরবগাহ ও অনন্ত রহস্যময়। কবির কথায়—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

(কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাব্যগ্রন্থ : শেষ লেখা, সংখ্যা ১৩, ২৭ জুলাই ১৯৪১)

কিন্তু এখানেই চল্লিশের দশকের কবিতার রূপ ও স্বরূপের ইতিকথার ইতি নয়। সমকালীন সংকটজনিত মানবের ক্ষোভ, দুঃখ, প্রতিবাদ, অনন্ত জিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধানের এ-এক কড়ি-কোমলে আধারিত কাব্যশিল্পে বিন্যস্ত প্রতিবেদন। কিন্তু এই সমকালেই আরও কত কবির সহজাত প্রেম, প্রকৃতি, অনন্ত ভালোবাসার ছান্দসিক বাণীও ছিল। এবার তারই সন্তর্পিত অনুসন্ধান।

সামাজিক দায়বদ্ধতার গরজ, সময়ের সোদরপ্রতিমতা, উদ্‌বেল সময়ের উপযোগী কণ্ঠস্বরকে দূরে সরিয়ে রেখে চল্লিশের দশকে আর-একটি স্বতন্ত্র ধারার কবিতা উৎসারিত হয়েছিল। নিরুদ্‌বিগ্ন জীবনের প্রতি ঝোঁক, মায়ামমতার মেদুরতায় আচ্ছন্ন, নিপুণ ছন্দের লিরিক বিন্যাস— এইসব উপজীব্য করে একদল কবি সাজিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের কবিতার জগৎ। রাজনৈতিক বিশ্বাসজাত কবিতার বৈচিত্র্যহীনতা, সময়ের কাছে সমর্পিত প্রবণতার একরূপতা থেকে মুক্তির তীব্র অভীপ্সায় চল্লিশের অনেক কবি যেমন রোমান্টিক লিরিক-প্রবণতার দিকে ঝুঁকেছিলেন তেমনই লিরিকের প্রতি প্রথমাবধি আস্থা রেখেই কাব্যচর্চা করেছিলেন আর-একদল কবি। যাঁরা রাজনৈতিক আবহজাত বিষয় বদলে নিলেন; তাঁদের কবিতার ভাষায় উঠে এল—

আমি গাছে রসের মতো প্রবাহিত হই
তোমাকে ফুটিয়ে তুলব
জল নড়ে না একটুও
ছায়া দোলে না কোথাও
নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাব আমি।

('কয়েকটি কথা', অরুণ মিত্র)

সমস্ত কবিজীবন ধরে শূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে অরুণ মিত্র ভালোবাসার কবিতা লিখেছেন—

তখন থেকেই শুরু হয়েছে লড়াই
কচি গলায় যখন দুধের ফোঁটা নেমেছে,
শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই।
তারপর তুমি আপন ক'রে নিয়েছো কত কী

('শূন্যতার বিরুদ্ধে, খুঁজতে খুঁজতে এতদূর')

জীবনের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম আর শরীরের প্রতি অনুরাগ একাকার হয়ে যায় তাঁর কবিতায়—

আমি পলিমাটি ছুঁলেই বুঝি
নিজেদের জগতে এলাম।

('ফসলের সুরে, উৎসের দিকে')

বাংলাদেশের জল-মাটি-হাওয়া, বাংলা মেলা, আমজামের গাঁ, তালপাতার ভেঁপু, ছায়াবটের ঝুরি, কচুপাতায় বৃষ্টির ফোঁটা, তালবনের দিঘিতে বাংলার বৃষ্টির নরম রূপ, ধনধান্যে ও পুষ্পে ভরা দেশের শোভা, ঘুঘু-ডাকা দুপুর, খেজুর গাছে টাঙানো ভাঁড় আর পুকুরের পাড়— স্মৃতির গাঢ় মাধুর্য আর কোমল বেদনায় মিশে বারেবারে অরুণ মিত্রের কবিতায় আসে।

অশোকবিজয় রাহা-র (১৯১০-১৯৯০) কবিতা কোমলে-কঠোরে বিচিত্ররূপিণী। আরণ্যক প্রকৃতিই হোক, কিংবা মানুষের প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনাই হোক, তাঁর লেখনীর জাদুস্পর্শে আমাদের পরিচিত জীবন ও জগৎ এক অপরূপ সত্তায় রূপান্তরিত হয়। অভিনব রূপকল্প নির্মাণে তাঁর সমকক্ষ কবি দুর্লভ। তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর অসমে কেটেছে। সেখানকার পার্বত্য-প্রকৃতি ও পার্বত্য-জীবনের চিত্রবিচিত্র ছায়া তাঁর কাব্যে পড়েছে। কবি শ্রীহট্টের মানুষ ছিলেন। বঙ্গ ভাগের আগে শ্রীহট্ট অসমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর কবিতায় পাই ভাষার কৃত্রিমতা পরিহার ও চিত্ররূপময় প্রতীক উদ্ভাবন—

নদীর ওপারে আকাশে আবির-ঝড়,
আলতা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধু-ধু হাওয়া এলোচুলে,—
দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

('ফাল্গুন', ডিহাং নদীর বাঁকে, ১৯৪১)

তাঁর অনেক কবিতায় আমাদের দৃষ্টিপথে নানা ছবি ভেসে ওঠে। যেমন

মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি— আরে!
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!

('একটি সন্ধ্যা', ভানুমতীর মাঠ, ১৯৪২)

টেলিগ্রাফের তারে আটকে-যাওয়া চাঁদের এই দৃশ্য শুধুমাত্র আমাদের চোখের সামনে একটি ছবিই ফুটিয়ে তোলে না, তা আমাদের মনের গভীরে মননকে আলোড়িত করে প্রকৃতি আর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সংঘাতের ব্যঞ্জনা জাগিয়ে তোলে। তাঁর কবিতায় সমাজ-সচেতনতাও স্পষ্ট—

মাঠে-মাঠে দুর্ভিক্ষের ভুখা প্রেত নাচে,
চারিদিকে মড়কের অনুচর দল
দেহহীন ছায়া-মূর্তি বুকে হেঁটে ঘোরাফেরা করে,
ভাঙা-হাটে কঙ্কাল কুকুর
ধুলা শোঁকে, ভাঙা হাঁড়ি চাটে।

('ভৌতিক', রক্ত-সন্ধ্যা, ১৯৪৫)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (২৭.৩.১৯১৭-৩০.৫.১৯৭৬) নিটোল রোমান্টিক কবিমন, এমন-কি মার্ক্সীয় ভাববাদে নিকষ দীক্ষিত অন্তরঙ্গদের সান্নিধ্যপ্রভাব সত্ত্বেও, স্বপ্নের নীলিমা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পুরোপুরি আগ্রহবিহীন। তাই প্রায়ই এমন উচ্ছল ভাষা—

আমের মুকুলে ফাগুনের আলো তুলেছে ঢেউ
আমাদের কথা জানে না কেউ।
রজনীগন্ধা ঋজু আর শাদা হ'য়ে
স্মৃতির স্তূপকে আলগোছে ছোঁয়
ভীরু তার হাত দিয়ে।
অনেক পাখির কাকলিতে ভরা সন্ধ্যা
রাত আসে দেখি মৃত্যুর মতো বন্ধ্যা
মনের আকাশ স্তব্ধ বিশাল : ছিল কি কেউ?
আমের মুকুলে ফাগুনের আলো তুলেছে ঢেউ।

('ঢেউ', রাজধানীর তন্দ্রা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৪৩)

কিন্তু যুদ্ধ, পরাধীন দেশ, সমাজ-বৈকল্য, হয়তো বন্ধুদের দৃষ্টান্ত নয়তো উপরোধ তাঁকে কখনো অন্য কথা ভাবিয়েছে—

আজকে কেন ক্ষিপ্ত লোক?
জ্বলছে কেন রক্ত চোখ?
মানুষ কাটো বাংলা কাটো
ভারত করো খণ্ডিত,
বলছে হিরু, বলে সিরাজ
বলছে মূর্খ পণ্ডিতও।

('১৯৪৭-এর ছড়া', একা, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৪)

সুকান্তের অকালমৃত্যুতে কবি বেদনায় আপ্লুত—

আজকে দাঙ্গার নীতি, কীটজীর্ণ বিবর্ণ জীবন
কিশোর কবির মৃত্যু, দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রতিক্ষণ।
ক্লান্তি আর অবসাদ অন্ধকারে ঘোরে চতুর্দিকে

জীবন-যৌবন সব রঙহীন অবাস্তব ফিকে।

('পুনরুজ্জীবন', একা, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৪)

'পরিবেশের উর্ধ্বে যে শিল্পী-আত্মা পক্ষপ্রসারণ করে নিজের আকাশ চায়, সে শিল্পী সহস্র বন্ধনের মধ্যে চির একক'। কথাটি বলেছিলেন 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায় (২৫ বৈশাখ ১৩৬৫) গিরিবালা দেবীর (১৪ ভাদ্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ-১৭ ফাল্গুন ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) কন্যা বাণী রায় (৫.১১.১৯১৮-১৬.১০.১৯৯২)। চল্লিশের দশকের চিরায়ত প্রেমের, নিসর্গমুগ্ধতার, আত্মমগ্নতার কবি হলেন বাণী রায়। তাঁর রোমান্টিক মন বলে ওঠে—

পাখিকে দিয়েছ তুমি সীমাহীন স্থান,
আমাকে দিয়েছ তুমি সীমাহীন প্রাণ।
কত বার ম'রে ম'রে আসিলাম ফিরে;
শঙ্কিত কম্পিত পায়ে তমসার তীরে।
মরেছি হাজার বার প্রেমের মরণে,
নূপুর বেজেছে কত চরণে চরণে!

('বৎসরের গান')

সময়ের দুর্বিপাক থেকে জীবনানুরাগের উপাদান না-পেয়ে চল্লিশের দশকে লিরিকধর্মিতাও স্পষ্ট হয়ে উঠল কবিতায়—

যদি ম'রে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝ'রে যাই;
যে ফুলের নেই কোনো ফল
যে-ফুলের গন্ধই সম্বল;
যে-গন্ধের আয়ু একদিন
উতরোল রাত্রিতে বিলীন;
সেই রাত্রি তোমারই দখলে
আমার সর্বস্ব দিয়ে জ্বলে,
আমার সত্তাকে ক'রে ছাই।
ফুল হ'য়ে যেন ঝ'রে যাই।

('প্রার্থনা', অরুণকুমার সরকার)

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী (১৯২২-২০০৯) বেদনাপ্লুত ভাষায় অতীতকে ফিরে দেখেন—

ডুবে গেছে কত শান্তির সংসার।
ত্রস্ত গোরুর দুটি চোখ দেখে ভয়,
ধ'রে আছে লোক উঁচু বাড়িটির চুড়ো,
সাহায্য দরকার।
জলে ভাসে ঘর— সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায় তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
শুনতে পারিনে আর।
গণক প্রেমিকে ভিক্ষুকে গুলজার
রূপসী শহর— কোথায় আরশি তার?

('আরশিনগর', কাব্যগ্রন্থ : আরশিনগর)

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (১০.১২.১৯১৬-২৪.৪.২০০৯) তাঁর সুদূরের কল্পনার বিহঙ্গ উড্ডীনতাকে বারবার বেঁধে নিতে চান দৈনন্দিনে, প্রাত্যহিকে। প্রত্যহকে মেনে নিয়েই কল্পনার মুক্তির দিকে তাঁর যাত্রা। তাই 'কোনো মৃত্যু-শিয়রে— আবহমান' কবিতায় তিনি জীবনের প্রান্তিক কথা শোনান—

যতদিন ধ'রে অঞ্চলে ভ'রে যত গোধূলির আলো
নিয়েছো সে-সব ফ্যালো— এইবার ফ্যালো—
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন
মৃত্যু রয়েছে অলক্ষ্যে, তার উত্তরী উড্ডীন।
শপথ স্বীকৃতি যা-কিছু মাটির সবই কালে হবে কালো।

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আনন্দবেদনার রোজনামচা না-লিখে সময়কে নিয়ে আক্ষেপ, সময়ের সংলগ্নতার কারণে অসহায়তা, আর্তি চল্লিশের দশকের কবিতায় স্পষ্ট সততায় উচ্চারিত হয়েছিল। কবিতার ঘরোয়া বাতাবরণকে অতিক্রম করে এই সময়ের কবি সমাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সে-দৃষ্টিতে ছিল পরিচ্ছন্ন মানবতার দৃষ্টি। চল্লিশের দায়বদ্ধ কবিতার ধারায় যা এক স্বতন্ত্র কাব্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। কবি হরপ্রসাদ মিত্র (১.১.১৯১৭-১৫.৮.১৯৯৪) 'এসপ্ল্যানেড' কবিতায় লিখছেন—

এখানে শহর লক্ষ কণ্ঠে প্রগল্‌ভ।
এখানে দাঁড়িয়ে এ-মাটি মাড়িয়ে কী বলবো?
যন্ত্রের কথা ফুরোলে বরং রাত্রে— গভীর রাত্রে
হৃদ্‌যন্ত্রের শ্রান্তি ঘুচিয়ো নতুন মদের পাত্রে।
লাগবে বাতাস তৃষিত শরীরে মনে।
গভীর অন্বেষণে—
হয়তো বা দেবে চূড়ান্ত নির্বেদ
বহুমন্থনমুক্ত এস্‌প্ল্যানেড।

চল্লিশের দশকের কবিতায় প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ছিল। আর ছিল ছোট ছোট বৃত্ত আঁকার প্রয়াস। কবি নরেশ গুহ-র

(৩.৩.১৯২৩-৪.১.২০০৯) 'দুরন্ত দুপুর' কাব্যগ্রন্থের (১৯৫২) কবিতাগুলির লিরিকধর্মিতা এই সময়ের একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বলতেই হয়। 'দুরন্ত দুপুর' কাব্য গীতিময় ধ্বনি আর উত্তাপে অনন্য। এই রোমান্টিকতা ও বিস্ময়বোধ আমাদের আবিষ্ট করে—

সারাদিন থাকি এক নদীর পাশেই,
ছোটো এক নদী।
রূপালি প্রলাপ তার স্রোতে উদ্বেল,
আঁকাবাঁকা গতি।
সারাদিন থাকি এক মেয়ের পাশেই,
নদী তার দেহ, তার মন
নিশিদিন ডাকে, তার কণ্ঠ-কুহক
কথা-কওয়া-নদীর মতন।
সারাদিন গান শুনি, কথা শুনি তার,
ভাষা বুঝি নাই।
সারাটি বসন্ত ভ'রে দেখেছি দীঘল
মায়াবিনী চোখের দোহাই।

('দুই নদী')

চল্লিশের কবিতায় এই প্রাণের স্পন্দন ছিল অকৃত্রিম। বিদ্রোহের বাণী, পুঁজিবাদীর প্রতিরোধী সংকল্প, জবাকুসুমসংকাশ প্রভাত, দুরন্ত দুপুর, স্বর্ণাভ সন্ধ্যা বা ভালোবাসার মেদুর স্মৃতি সবই এই সময়ের কবি-লেখনীতে আত্মজ বাণীতে চিত্রময় হয়ে উঠেছিল। চিন্তা, ভাবনা, বৈদগ্ধ্য ও মননের বাতাবরণ থাকলেও তা ছিল ঋজু মানবিকতায় সম্পৃক্ত। কবিতার শিল্পরূপে আঙ্গিক বিন্যাসও বিনত ছিল। অবশ্য তাৎক্ষণিক আবেগ-অন্বিত কাব্যধর্মে গুণাভাস থাকলেও তা ছিল কবির স্বাভাবিক প্রাণের ধর্ম। এখানেই চল্লিশের কবিতার অতুলতা। ❑